

## অধ্যায়-৬: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

**প্রশ্ন ১:** “আমাদের দুর্বলতা, ভীৰুতা, কলুষ আর লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক; আসাদের শাট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।”

ডা. বো., রা. বো., চ. বো. ১৭/

- ক. জাতিসংঘের কোন অঙ্গ-সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দেয়? ১
- খ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতকে ‘কালরাত’ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের কবিতার লাইনগুলি তোমার পাঠ্যবইয়ের যে আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

**খ.** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাজ্ঞা চালায়। তাই এ রাতটি কালরাত হিসেবে পরিচিত।

এ হত্যাজ্ঞার নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিক্কা খান, খাদিম হোসেন, রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘটনা অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাকবাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। তাই এ রাতটি ‘কালরাত’ নামে আখ্যা পেয়েছে।

**গ.** উদ্দীপকের কবিতার লাইনগুলি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ আন্দোলনের পটভূমি ছিল ছয়দফাভিত্তিক বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বক্তৃত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হন।

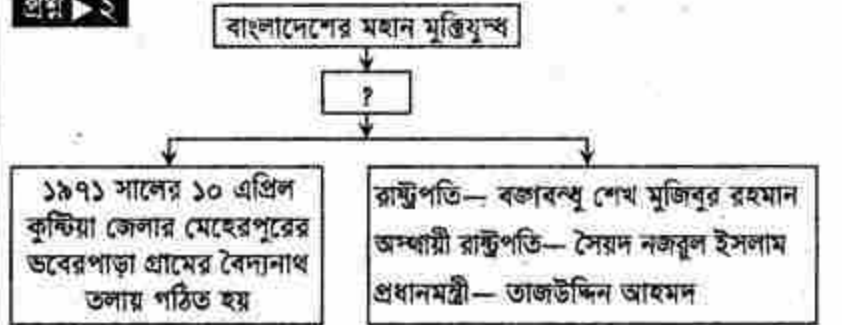
উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতার লাইনগুলো এদেশের দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান অর্জনকে তুলে ধরে। ছাত্রনেতা আসাদ ছিলেন ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী একজন শহিদ। আর এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বস্তুত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বাঙালির মনে যে ক্ষোভের বহিঃশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ১৯৬৯ সালে তাঁ আরো জোরদার হয়। অন্যদিকে, আগরতলা মামলার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৮টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে ‘গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি’ (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে DAC নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ছিল ‘ডাক’-এর উদ্দেশ্য। বিক্ষুব্ধ জনতা আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ডাক এর ব্যানারে ঐক্যবন্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে ছাত্ররা তাদের এগারো দফা দাবি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশে পুলিশ বাঁধা দিলে ছাত্রদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। ফলে ছাত্রনেতা আসাদসহ আরও তিনজন নিহত হয়।

**ঘ.** বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। রাজনীতিতে আইয়ুব খান সমর্থিত এলিটশ্রেণির মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনে আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হলে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লৌহমানব খ্যাত আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত হতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। উল্লেখ্য যে, ছয়দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটে ওঠে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণরায়ের চরম প্রতিফলন দেখা যায়। নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিণীম।

### প্রশ্ন ২



ডা. বো., রা. বো., চ. বো. ১৭/

- ক. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সেক্টর ছিল? ১
- খ. ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত ‘?’ দ্বারা ঐতিহাসিক কোন সরকারকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উক্ত সরকারের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মুক্তিযুদ্ধে এগারোটি সেক্টর ছিল।

**খ.** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। এ কারণে এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র জনতা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের প্রতিহত করতে থাকে। মূলত তার এ ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এজন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।



গ প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '১' দ্বারা ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়প্রার্থকরী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিদেশে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ভূমিমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান; পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; তিন বাহিনীর প্রধান যথাক্রমে কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল (অব) আব্দুর রব, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যান্টেন এ. কে. খন্দকার। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত '১' চিহ্নটি দ্বারা মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

অনেকটা অপরিবর্তিতভাবে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর সাংগঠনিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত রূপ দেওয়া হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি সরকারের যে প্রশাসনিক কাঠামো থাকে এবং যে সকল দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার সেরকম একটি গতিশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল এবং সরকারের দৈনন্দিন সকল কার্যাদিও এ সরকার সফলতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করত।

মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর সামরিক-বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া বেশ কিছু সাবসেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। এসব সেক্টর ও ফোর্সে যুদ্ধ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা এবং সাথে সাথে সারাবিধে আলোড়ন সৃষ্টি করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকার যে অপরিসীম অবদান রেখেছিল তা সত্যিই বিশ্বের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ৩ পাহাড়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদটি দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারে ছিল। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজ উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে বেশি হয়েছে। স্কুল, ডাকঘর, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, বাজার দক্ষিণাঞ্চলেই স্থাপিত হয়। এলাকার লোকজনকে যে কোনো প্রয়োজনে দক্ষিণাঞ্চলের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ প্রভাবশালী ও সেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সেচ্ছাচারিতায় উত্তরাঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারল চেয়ারম্যান পদ উত্তরাঞ্চলের দখলে না আসা পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের অত্যাচার হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উত্তরের সকলে জোটবদ্ধ হয়ে উত্তরের প্রার্থীকে ভোট দিল। ফলে উত্তরের প্রার্থী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলো। কিন্তু নানা কৌশলে দক্ষিণের লোকজন নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে তার পদে বসতে বাধা দিল।

(দি. বো., ক. বো., সি. বো., ঘ. বো., ঙ. বো. ১৭)

- ক. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়? ১  
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকের নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. বাংলাদেশের ইতিহাসে, উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সিপাহি বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়।

খ. ১৯২০ সালে ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে এবং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস আন্দোলনের আহ্বান জানান তাই অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করলে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, যা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এ সকল ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ এবং ভারতে নিজেদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধী এ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের পাহাড়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদটি দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারে ছিল। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে অধিক ব্যয় করা হতো। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সেচ্ছাচারিতায় উত্তরাঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উত্তরের প্রার্থী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য, অত্যাচার নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নিরঙ্কুশভাবে বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগের পর থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের হাতে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য অত্যাচার নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। আর পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সামরিক সকল দিক থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নানা আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর, জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে পাক-গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. বাংলাদেশের ইতিহাসে উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সর্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল যেমন চমকপ্রদ, তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও এ নির্বাচনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতন ঘন্টা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকেরা নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আর এ কারণেই বলা হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহত ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তারা নিজেদের শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে ভাবতে শেখে। তারা পাক শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে আর ভয় পায় না। এ সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সূর্যকে।



**প্রশ্ন ৪** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলোপ এবং গণতন্ত্রের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে গ্যাটসবার্গ নামক স্থানে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে 'গ্যাটসবার্গ এড্রেস' নামে খ্যাত। তার এ ভাষণের ব্যাপ্তি ছিল মাত্র তিন মিনিট। ভাষণে তিনি গণতন্ত্র, শোষিত মানুষের মুক্তি ও অধিকারের কথা বলেছেন। পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দাস প্রথা বিলোপে এটি একটি মাইলফলক।

(দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭; নরসিংদী মডেল কলেজ)

- ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে পেশ করা হয়? ১
- খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের কোন মহান নেতার ভাষণের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় উভয় নেতার ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বাংলার মহান নেতার ভাষণ ছিল আরও দিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালে পেশ করা হয়।

**খ** হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা জাতি— কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্থাপিত এ তত্ত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। এ মতামতই দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিতি।

**গ** উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের তুলনা করা যায়।

১৮৬৩ সালে আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। তার এ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যবহুল ঘটনা। এ ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা। এ ভাষণের পরপরই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে তৃতীয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও তিনি এ ভাষণে গণহত্যার তদন্ত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণেরই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে আব্রাহাম লিংকনের ভাষণে।

**ঘ** প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষণের মতো বাংলাদেশের উক্ত মহান নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অধিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত— উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল আব্রাহাম লিংকনের ভাষণটির মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৩ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ৩ মিনিটের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কাছে ধ্বনিত হলো গণতন্ত্র সম্বন্ধে তার বিখ্যাত উক্তি, 'This Government of the people, by the people and for the people will never perish from the earth.' আর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' ৭ মার্চের এ ৭টি শব্দ বাঙালিকে দুর্বীর করে তুলেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। যদিও বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তারপরও মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার সবুজ সংকেত দেখতে পান। তিনি স্বাধীন কঠোর ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তার এ ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ভাষণটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর এদিক থেকেই আব্রাহাম লিংকনের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অধিক নির্দেশনামূলক ও গুরুত্ববহ।

**প্রশ্ন ৫** ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৈরতলা রেল ব্রিজের পাশে একটি গণকবর আছে। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়-গোড় আর পঁচা লাশ। পাশাপাশি দুইটা বিশাল গর্ত। আনুমানিক তিন চারশ মানুষের মরদেহ এখানে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। এগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরপরাধ মানুষের সমাধি। হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আল বদরদের হাতে তারা শহিদ হয়েছেন।'

(দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭)

- ক. ছয়দফা কর্মসূচি কে পেশ করেন? ১
- খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের আলোকে মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দাও। ৪

#### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

**খ** ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে যে মামলা দায়ের করা হয় তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

আগরতলা মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল— বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় আগরতলা মামলা।

**গ** উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদেরকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৩ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়া জাল ভেঙ্গে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের এ যুদ্ধে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে স্বাধীনতা। উদ্দীপকে এ সময়ের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৈরতলা রেল ব্রিজের পাশে একটি গণকবর আছে। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়-গোড় আর পঁচা লাশ। প্রত্যক্ষদর্শীর এ বক্তব্য আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ-তীক্ষ্ণ স্বীকার করে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। তারা নির্বিচারে সাধারণ জনগণকে হত্যা করে। উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যেও এ সময়কার হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

**ঘ** ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিকামী বাঙালি জাতির ওপর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যা পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নির্যাতনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি জাতির নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এদেশের আপামর জনসাধারণের উপর গণহত্যা ও অমানবিক নির্যাতন চালায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালিদের বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত পাক-হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা, লুণ্ঠন ও অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কালরাত হানাদার বাহিনী বাংলার ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ জনগণের ওপর গণহত্যা চালায়। এর মাধ্যমে শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মার্চ থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে এ যুদ্ধ। এ সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ বাঙালিদের ওপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তাদের এ সকল অপকর্মে তাদেরকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে এদেশের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল। তারা নিজেদের রাজাকার বাহিনী, আল-বদর, আল-শামস সহ বিভিন্ন নাম দিয়ে সংগঠিত করে এবং পাক বাহিনীকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দান করে। তাদের সহায়তায় পাক বাহিনী আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। পাক-বাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি। তারা এদেশের মা-বোনদের সম্মুখে নেওয়ার মত জঘন্য কাজ থেকেও বিরত থাকেনি। মুক্তিবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাক হানাদার বাহিনী তাদের দোসর রাজাকারদের সহায়তায় ১৪ ডিসেম্বর আরেক দফা বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করে দেওয়ার জন্য তারা ঐ দিন এদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের বাঙালিদের ওপর পাক-বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এক নির্মম অধ্যায় সংযোজন করেছে। অবশেষে বহু নির্যাতন ও ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে বীর বাঙালি দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে। বাঙালির এ আত্মত্যাগের চিত্রই উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

**প্রশ্ন ৬** সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে ভিয়েতনামের দুই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। এর ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ভিয়েতনামের দুই অংশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এতে বহু নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ এবং শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাশে পরিণত করে। অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়।

(সকল বো. ১৬)

- ক. বাংলাদেশকে কোন দেশ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে? ১
- খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সর্বপ্রথম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

**খ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে দূত পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা ছিল মুজিবনগর সরকার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনা করার বিষয়টিও এ সরকার গঠনের পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর পরিচালিত হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। ২৫ মার্চ রাতে এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের এ ঘৃণ্য অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। উদ্দীপকেও এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে ভিয়েতনামের দুই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। ফলে দুই ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের একপর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঠিক একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা সৃষ্টি হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক) সাথে আলোচনার নামে তারা কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তানে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে বাঙালির ওপর আক্রমণের নির্দেশ জারি করে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় এক গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। ওই রাতে অসংখ্য নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ সংখ্যা ৩৫,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপকের গণহত্যাও বাঙালির এ নির্মম দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে।



**ঘ** উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ মার্চের গণহত্যাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডটি ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের একটি চিত্র মাত্র। একইভাবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক-হানাদার বাহিনী পূর্বপাকিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর এক ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডটিও ছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্র।

২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার পরই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিসেনাদের গেরিলা আক্রমণে জনসমর্থনহীন পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। বর্বর পাকিস্তানিরা এ সময় নিরীহ বেসামরিক জনতার ওপর আক্রমণ করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে থাকে। ছাত্র-যুবকদের দেখামাত্রই তারা গুলি করে হত্যা করে। সমগ্র বাংলাদেশকে ধ্বংস করার নেশায় পাকবাহিনী মেতে ওঠে। শহর, গ্রাম, সমগ্র দেশেই তারা অমানবিক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। যুদ্ধ চলাকালে হানাদার বাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস (স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী) প্রভৃতি বাহিনীর সহায়তায় এ দেশের নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন করে এবং অসংখ্য নারীর সন্ত্রাসহানি ঘটায়। যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাক হানাদার বাহিনী তাদের দোসরদের নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর আরেক দফা বর্বর হত্যাজ্ঞা চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্যই ঐদিন পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ২৫ মার্চ রাতের হত্যাকাণ্ডটি ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেননা দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকবাহিনী এ দেশের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।

**প্রশ্ন ৭** ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিষ্টান রাজশক্তির কাছে বসনিয় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শোষিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। এতে বসনিয় জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোশ্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। রাজকীয় সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে। বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারীর ইজ্জত লুটে নেয়। শিশুরাও রেহাই পায় না, তারপরও বসনিয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এখনও সেখানে বসনিয়দের বহু গণকবর আবিষ্কৃত হচ্ছে। /সকল বোর্ড-২০১৫, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/

- ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? ১
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বসনিয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য ব্যাখ্যাসহ লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ দাও। ৪

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ হলেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

**খ** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্য বঞ্ছনা করার জবাব দেওয়া।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন প্রদান করে। এই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

**গ** উদ্দীপকের বসনিয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য হলো বসনিয় জনগণের মতো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসন, শোষণের শিকার হতে থাকে। তারা সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। একইভাবে উদ্দীপকেও আমরা লক্ষ করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই খ্রিষ্টান রাজশক্তির কাছে বসনিয় জনগণ শোষিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত হতে থাকে।

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসনক্ষমতার কর্তৃপক্ষ। পূর্ব বাংলার জননেতা এ কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। পশ্চিমাদের এ বৈষম্য নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং সামরিক সামাজিক, শিক্ষাক্ষেত্রসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্যনীতিই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ বঞ্ছনার দিকটিই উদ্দীপকের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের বসনিয়ার মতোই বাংলাদেশও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্ছনায় অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পাক সরকার বাঙালিদের দমনের জন্য বাংলার অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ও শিশুদের ওপর চালায় নির্যাতন। এতসব অত্যাচারের পরও পাক সরকার বাঙালিদের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকে বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বসনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর যুগোশ্লাভিয়া সরকার যেভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে একইভাবে বাঙালিদের নির্বাচনে হত্যা করেছে পাকিস্তান সরকার। বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে স্তম্ভ করে দিতে তারা নানা অপতৎপরতা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় উজ্জীবিত অদম্য বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। এই যুদ্ধে সারা দেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে হানাদার বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিত্র।

**প্রশ্ন ৮** কুমারি নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত বসুমতি গ্রাম। নদীর উত্তর পাড়ে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বসবাস সত্ত্বেও দক্ষিণ পাড়ের লোকেরা তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন করতে থাকে। ফলে উত্তর পাড়ের লোকেরা তাদের নেতা শরিফ খানের নেতৃত্বে প্রতিবাদমুখর হতে থাকে। তারা স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে। দক্ষিণ পাড়ের লোকেরা তাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায় এবং তাদের নেতাকে ধরে নিয়ে যায়। নেতার অবর্তমানে তারা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। তারা সুষ্ঠু নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করে স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

[পূনিশ হাইস্কুল এক কলেজ, রংপুর]

- ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'চরমপত্র' কে পাঠ করতেন? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুক্তিযুদ্ধের সময় চরমপত্র পাঠ করতেন এম আর আখতার মুকুল।

**খ** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট হিসেবে পরিচিত।

এ হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিক্কা খান, খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিচিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে।

**গ** অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং যুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠন করা হয় মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।

পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর পশ্চিমা পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন চরমে পৌঁছলে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যার নাম দেওয়া হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমেই যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। এ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অর্থ সরবরাহ, বিশ্ব জনমত আদায়ের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

কুমারি নদীর উত্তর পাড়ের লোকেরা যেভাবে কমিটি গঠন করে তাদের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তেমনি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাঙালিরা যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন— তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ— যারা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই দূরদর্শী নেতা। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়াদিসহ সকল দিক সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করে তোলেন এবং তার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন শক্তিশালী সংগঠক ও পরিচালক।

ক্যাণ্টেন এম. মনসুর আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র, প্রশিক্ষণের অর্থের সংস্থান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ, ত্রাণশিবিরে ত্রাণ বিতরণ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে তার অবদান অসামান্য।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় স্ব-স্ব দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করে মুজিবনগর সরকারের সদস্যরা বাংলাদেশ নামক একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

**প্রশ্ন ৯** প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যকে তালিকায় যুক্ত করে ইউনেস্কো। এবার যোগ হয়েছে ৭৮টি নথি। এগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একটি। এর অনন্য দিক হলো, ইউনেস্কোর এটাই প্রথম স্বীকৃত ভাষণ, যা আগে থেকে লিপিবদ্ধ ছিল না।

[আব্দুল কাদির মোহা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

- ক. 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ঘোষণা করেন কে? ১
- খ. ভাষা আন্দোলন স্মরণীয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লিখিত ভাষণের তাৎপর্য কতটুকু তা মূল্যায়ন কর। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

**খ** বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভাষা আন্দোলন স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভাষা আন্দোলন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জব্বারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণের সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। সম্প্রতি এ ভাষণটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আর এ ভাষণটিই হচ্ছে ইউনেস্কোর প্রথম স্বীকৃত ভাষণ। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটির সুদীর্ঘ পটভূমি বিদ্যমান। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত



দীর্ঘ ২৪ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণকে। বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে- যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও ১মার্চ ইয়াহিয়া খান এ অধিবেশন অনিদিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং জনগণের দাবি মানা না হলে খাজনা ও ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কর্মসূচি পালিত হয়। তবে কর্মসূচি পালনকালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সহিংসতায় বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।

**খ** স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

৭ মার্চ বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ৭ মার্চের ভাষণ লক্ষ লক্ষ উপস্থিত-অনুপস্থিত শ্রোতার মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল। ৭ মার্চের ভাষণ কালোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ ভাষণ। ঐক্যবন্ধ জাতি গঠনে এর ভূমিকা অপরিসীম। ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দলিল হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এ ভাষণ মূলত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে শাখত প্রেরণার উৎস ও প্রতীক। এ ভাষণে তিনি শুধু স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন, যা পূর্ববাংলার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশনানুযায়ী দেশের স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রামী জনতা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রতিহত করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। ১০ মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ এতে কর্ণপাত না করে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অর্থাৎ ৭ মার্চের ভাষণে শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া সর্বত্রই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৬ মার্চ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকলেই পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১০** সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কিছু উগ্রবাদী শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। কোন ধরনের স্বাধীনতার ডাক বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করলেও গণহত্যা, লুটতরাজ ও উচ্ছেদের শিকার এই অসহায় মানুষগুলো সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের। নিরাপদে নিজ আবাস ভূমিতে রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ সরকার।

[সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি?

১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে পাকিস্তান আর্মি যুদ্ধের সূচনা করেছিল— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোন ঘটনার কী সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন ছিল ভিন্ন— ব্যাখ্যা কর। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

**খ** অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানি আর্মি যুদ্ধের সূচনা করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর রাজনৈতিক সংকট আরো তীব্র হয়। অন্যদিকে সংকট নিরসনের চেষ্টা না করে ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপন করে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি টিট্টা খানকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ মোতাবেক টিট্টা খান অপারেশন সার্চলাইট নামে খ্যাত অভিযানের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধের ঘোষণা করে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সাথে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে বাঙালি জনগণের ওপর ব্যাপক সামরিক, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। তাদের এ নৃশংসতা হতে মুক্তি পাবার জন্য লাখ লাখ বাঙালি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কিছু উগ্রবাদী শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম জাতিগত নিপীড়ন চালায়। গণহত্যা, লুটতরাজ ও উচ্ছেদের শিকার এই অসহায় মানুষগুলো সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা এদেশের জনগণের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করে এবং বাড়িঘর লুটপাট করে ধন-সম্পদ হস্তগত করে। তাদের এসকল নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার হতে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের জনগণ পালিয়ে সীমান্তবর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার বাংলাদেশি শরণার্থীদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত সরকার আশ্রয় দেয়। শুধু শরণার্থীদের আশ্রয় ও প্রতিপালন নয়, ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং বিশ্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের কথা প্রচার করে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশি শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন ভিন্ন ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

দীর্ঘ ২২ বছর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার বাঙালির একমাত্র প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতা। তাই তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাঙ্গিকভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাদের একমাত্র

লক্ষ্য ছিল হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের প্রত্যাশা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। উদ্দীপকের রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মায়ানমারে ফিরে যাওয়াই একমাত্র প্রত্যাশা। স্বাধীনতা অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা নয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিমা হানাদারদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণ স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীরাও সেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা নিজ দেশে ফিরে আসার পাশাপাশি দেশকে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এ লক্ষ্যেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা মরণপণ যুদ্ধ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন উদ্দীপকে উল্লিখিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা হতে ভিন্নতর।

**প্রশ্ন ১১** ইতিহাস শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করতে বললে আরিফ নিম্নলিখিত দিকগুলো চিহ্নিত করে।

ছক-০১	ছক-০২
১. ছয় দফা কর্মসূচির উপস্থাপনের পটভূমি	১. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি
২. ছয় দফা দাবিসমূহ	২. ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু
৩. ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

[বি এ এক শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১  
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে আরিফের আলোচিত ছক-০২ এর ২নং দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে আরিফের আলোচিত ছক-০১ এর ৩নং দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

**খ** আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর প্রতিশ্রুত গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন। এটাকে Basic Democracy বা মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়। এ ব্যবস্থায় উভয় প্রদেশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করার ভোটাধিকার অর্পণ করা হয়।

**গ** আরিফের আলোচিত ছক ০২-এর ২ নং দিকটি হলো ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বলতে গেলে এ ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটে।

৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল জাতীয় পরিষদে যোগদানের শর্ত হিসেবে চারটি দাবি উত্থাপন। যথা-

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে।
৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই ভাষণ ইউনেস্কো তাদের ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজের অংশ করার মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করেছে।

**ঘ** আরিফের আলোচিত ছক-০১ এর ৩নং বিষয়টি হলো- ছয় দফা দাবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সীমাহীন বৈষম্য প্রদর্শন করে তা নিরসনের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালিদের বাঁচার দাবি। এ ছয় দফা দাবি ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে এ আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আলাদাভাবে একটি জাতিসত্তাবোধের জন্ম হতে থাকে। সকল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয় দফার মধ্যে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এজন্যই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট ছয় দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ছয় দফা আন্দোলন বাঙালির মানবিক চেতনার জন্ম দেয় এবং জাতীয়তাবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালের সমস্ত আন্দোলন এমনকি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছয় দফার চেতনাবোধ।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

**প্রশ্ন ১২** আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের পথিকৃত আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও মিষ্টি ব্যবহার তাকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এইভাবে একজন মেহনতি মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তার ঐতিহাসিক ভাষণ "Government of the People, by the People and for the People"। আজও তাকে অমর করে রেখেছে।

[মিহরদী সরকারি কলেজ, পাবনা]

- ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? ১  
খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপতির সাথে তোমার পঠিত কোন রাষ্ট্রপতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত নেতার চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

**খ** সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি আব্রাহাম লিংকন ছিলেন দয়া, সরলতা, বাগ্মিতা ও মিষ্টি ব্যবহারের অধিকারী। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ বিষয়গুলোর মাঝে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে, আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ উভয়ই ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার চরিত্রে দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বাগ্মিতার সন্নিবেশ ঘটেছিল। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি বাংলার মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে তিনি নিরীহ বাঙালিদের রক্ষা করেন। আর বীর বাঙালি তার নেতৃত্বে অস্ত্রধারণ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল।

**ঘ** উক্ত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপসহীন বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।



আব্রাহাম লিংকন যেমন স্বাধীনতা মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও পাক-শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন। তারই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। আর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া তিনি ১৯৬৬ সালের ছয়দফাভিত্তিক আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয় এবং ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

**প্রশ্ন ১৩** কানাডার নাগরিক জনসন বিশ্বখ্যাত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টে কাজ করে থাকেন। তিনি গত সপ্তাহে দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। একটি অঞ্চলের হাতেই অন্য অঞ্চলের সকল অর্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হতো। শোষিত অঞ্চলের মধ্যে তাদের অর্জিত সম্পদের মাত্র ১৬% ব্যয় হতো। এ ধরনের বৈষম্যের কারণেই বৃহৎ দেশটি ভেঙ্গে শোষিত অঞ্চলটি একটি স্বাধীন দেশের রূপ নেয়।

(ঢাকা কলেজ, ঢাকা)

- ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ? ২
- গ. জনসনের রিপোর্ট তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনসন বর্ণিত কারণটি ছাড়াও 'অনেকগুলি কারণে বাংলাদেশের জন্ম' তোমার মতামত দাও। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

**খ** সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** জনসনের 'যুদ্ধ ও সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্ট আমার পাঠ্য বইয়ের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। উদ্দীপকে জনসনের রিপোর্টে তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের জনসন 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টে কাজ করে থাকেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। যেখানে দুই রাষ্ট্রের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো উঠে আসে। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি। বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে স্তম্ভ করে দিতে পাকিস্তান সরকার নানা অপতৎপরতা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় উজ্জীবিত অদম্য বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। এই যুদ্ধে সারা দেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে হানাদার বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে।

তবে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** জনসন বর্ণিত অর্থনৈতিক কারণটি ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক নানা বৈষম্যমূলক নীতির কারণেই অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

দীর্ঘ ২৪ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণকে। বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে— যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। নির্বাচনের রায় স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা আরো বলিষ্ঠ ও শাণিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও তুরান্বিত করে।

উদ্দীপকে জনসনের রিপোর্টে দেখা যায়, একটি অঞ্চলের অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে অন্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। যা আমাদের পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। এ কারণটির পাশাপাশি পূর্ববাংলার প্রতি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামরিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব সন্তোষজনক ছিল না। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বাংলার জনগণ বৈষম্যের শিকার হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক কম। সামরিক দিক দিয়েও পূর্ব বাংলা ছিল অরক্ষিত।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে ঢাকায় এসে গোপনে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। হুকুম মতো ২৫ মার্চ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই হত্যা, অত্যাচার-অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালি জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বাঙালিদের মধ্যে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

**প্রশ্ন ১৪** ১৯৭১ এর মার্চ মাসের সময়টা ছিল ভয়ংকর। তারপরও সেই দিনগুলিতে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন সাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি নেতা পাকিস্তানের সরকারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন।

(আজিমপুর গড়, গালস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. ১৯৭০ এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান কে ছিলেন? ১
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭০ এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।



১৯৭০ সালের নির্বাচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— এ নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তান ভৌগোলিক কারণে কার্যত বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি এ নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া এ নির্বাচনে জনগণের রায় বাস্তবায়নে সরকারের অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে।

১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অজ্ঞানে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মূল বিষয় ছিল চারটি। প্রথমত, চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করা। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া। তৃতীয়ত, গণহত্যার তদন্ত করা। চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ্য করি, পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিকরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। এ সময় খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ মার্চ সরকার সামরিক আইন জারি করেন। ১৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। এরপর ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু বৈঠক অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করার আগে গণহত্যার আদেশ দিয়ে যায়। যার ফলে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। এভাবে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা।

প্রশ্ন ১৫



আব্দুল মোম্বা কামির সিটি কলেজ, নরসিংদী

ক. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত নারী কত জন?

- খ. মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার পথে কোনো ষড়যন্ত্রই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত নারী ২ জন।

খ. সৃজনশীল ৬ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাজঙ্ঘের ইজিত বহন করে।

২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাজঙ্ঘ চালানো হয়, তা ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নারকীয় ঘটনা। অপ্রতিহতভাবে ৩৬ ঘণ্টা ধরে মানবেতর মহাতাপবলীলা চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলগুলো তাদের হত্যাজঙ্ঘ থেকে রেহাই পায়নি। উদ্দীপকেও এ ঘটনার ইজিত প্রদান করা হয়েছে।

ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাজঙ্ঘ চালায়। যা বাঙালি তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় অপারেশন সার্চলাইট। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে এ অপারেশনে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে গভীর রাতে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরান ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, কলাবাগান, রায়েরবাজার প্রভৃতি স্থানে। এভাবে দেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানি নরপশুরা গণহত্যা চালায়। সুতরাং বলা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ছিল বাঙালির জন্য ভয়াবহ একটি রাত, যে রাতের চিত্রই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ. ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার পথে কোনো ষড়যন্ত্রই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না—কথাটি যথার্থ।

স্বাধীনতার বড় আকাঙ্ক্ষিত একটি শব্দ। এই স্বাধীনতা অর্জনে হাজার বাধা-বিপত্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়। স্বাধীনতা অর্জনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মুক্তির আশ্রয় নিতে মানুষ অকাতরে জীবন দিয়ে দেয়। তাই স্বাধীনতার চরম প্রকাশকে কখনোই কোনোভাবেই বৃদ্ধ করা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বাঙালির ন্যায় দাবিকে উপেক্ষা করে তারা ঘৃণা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এবং ২৫ মার্চ রাতে বীভৎস গণহত্যা চালায়। কিন্তু তারপরও বাঙালি জাতি ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে আসেনি। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করেছে কাক্ষিত স্বাধীনতা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্যায়ভাবে কখনোই কোনো জাতির স্বাধীনতার চেতনাকে নস্যাৎ করা যায় না।

প্রশ্ন ১৬ একটি চলচ্চিত্রে দেখান হয় একটি দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করছে। ঐ দেশেরই কিছু লোক সংগঠিত হয়ে নিজ দেশের বিরুদ্ধে নানা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের পক্ষে যোদ্ধাদের অবস্থান হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয়া, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজ দেশের স্বাধীনতাকে তারা অস্বীকার করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]

- ক. চরমপন্থ ও জন্মদের দরবার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কে? ১  
খ. মুজিব নগর সরকার সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২  
গ. চলচ্চিত্রে দেখান স্বাধীনতা বিরোধী লোকদের কর্মকাণ্ডের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোন শ্রেণির লোকদের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের সময় উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছে—কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪



ক. চরমপত্র ও জন্মদের দরবার অনুষ্ঠানটি যথাক্রমে এম. আর. আখতার মুকুল ও রাজু আহমদ পরিচালনা করতেন।

খ. মুক্তিযুদ্ধ সূচীভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়েই মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকারের দায়িত্ব ছিল দক্ষতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশকে শত্রুমুক্ত করা, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করা। মুক্তিযুদ্ধের সফলতার পেছনে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ. চলচ্চিত্রে দেখানো কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন কতিপয় বিশ্বাসঘাতক বাঙালির স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করে। পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তারা কতকগুলো দল গড়ে তোলে। এ দলগুলোর মধ্যে আলবদর ও রাজাকার বাহিনী ছিল অন্যতম। তারা পাকিস্তানিদের সাথে মিলিত হয়ে বাঙালিদের ওপর হত্যা ও নির্যাতন চালায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

চলচ্চিত্রে দেখানো প্রতিবেদনে এমন একদল লোককে দেখাচ্ছিল যারা সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রের বিপক্ষে নানা অপতৎপরতা চালায় এবং মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ দেশের স্বাধীনতাকে তারা অস্বীকার করে। একইভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি দখলদার বাহিনীর দোসর হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আলবদর বাহিনী একটি ভয়ঙ্কর দল ছিল। তাদের ওপর বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল দায়িত্ব ছিল। ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের হত্যাকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল এ দেশের দালালরা। উদ্দীপকে বর্ণিত চলচ্চিত্রের প্রতিবেদনটিতে এ বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের সময় উক্ত দিকটি অর্থাৎ স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতার দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছিল- উক্তিটি যথার্থ।

একটি দেশের স্বাধীনতা লাভ সে দেশের জন্য চরম অহঙ্কারের ও গর্বের বিষয়। আর এ স্বাধীনতা যদি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত, তাহলে এ স্বাধীনতা মানুষকে স্বর্গীয় অনুভূতি দান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল এমনই একটি গৌরবের বিষয় কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অপকর্মগুলো এই মহান অর্জনে কালিমা লেপন করে।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো আমাদের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে বাঙালিদেরকে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে আলবদর, রাজাকার, আল শামসসহ বিভিন্ন বাহিনী। তারা বাঙালি হয়েও পাক বাহিনীর হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তারা যদি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য না করত তাহলে আরো আগেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারতাম। তারা নিজেদের মানবিক সত্তা বিকিয়ে দিয়ে এবুপ হীন কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অপবিত্র হয়েছিল বাংলার শহীদদের রক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধীরা অত্যন্ত জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের মাথা বিশ্বদরবারে নিচু হয়ে আসে। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ড আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছিল।

প্রশ্ন ১৭ জনাব 'ক' বলল, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা আমাদের বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছে। তবে নির্বাচনী ফলাফল না মেনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানারকম টালবাহানা করার ফলে জনগণ আরও ক্ষুব্ধ হয়। তবে এদেশের মানুষের একটি অংশ (কতিপয় রাজনৈতিক দল) জন দাবির বিরোধিতা করে। কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে মুক্তিকামী জনগণের আপোষহীন আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

[সরকারি ডোমায়াম কলেজ, নারায়নগঞ্জ]

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়েছিল? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে বাঙালি জাতি কীভাবে নির্বাচন কেন্দ্রিক হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' নানারকম টালবাহানা বলতে কোন ঘটনাবলি নির্দেশ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর সর্বশেষ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল।

খ. গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এবং পাকিস্তানি সরকারের শোষণ হতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি জাতি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচনকেন্দ্রিক হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি ব্যালটের মাধ্যমে আস্থা জানিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তান সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন ও বৈষম্যের জবাব দেয়।

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' নানারকম টালবাহানা বলতে ১৯৭১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া'র ষড়যন্ত্রমূলক আচরণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি সব দিক থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করে আসছিল। বাঙালিদের ওপর তাদের বৈষম্য নীতি এত প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেও পশ্চিমা শাসক শ্রেণি আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা শুরু করে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। নিয়মানুযায়ী আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু শুরু হয় বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার অপতৎপরতা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করে। আর ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে। চারদিকে স্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" এভাবে বাঙালি পাক শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার টালবাহানার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর সর্বশেষ উক্তি অর্থাৎ সকল বাধা অতিক্রম করে মুক্তিকামী জনগণের আপসহীন আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি - বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সঠিক।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে বঞ্চিত করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পাক সরকার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। বাঙালিদের দমিয়ে রাখার জন্য তারা বিভিন্ন হীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শত বাধা অতিক্রম করে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। জনাব 'ক' এর সর্বশেষ উক্তিতে, এ কথাই প্রকাশ ঘটেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে।



১৯৭১ সালে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করে বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। আর ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ঢাকায় আসার ঘোষণা দেন। ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যর্থ আলোচনার পর কোনোরকম সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা ছাড়াই গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ২৫ মার্চের কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকহানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাজ্ঞা চালায়। আর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে বাঙালি জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে আলবদর, আল শামস, রাজাকার ও শান্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতা করলেও বীর বাঙালি তেজোদীপ্ততার সাথে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। পরিশেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান সরকারের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে আপসহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন ১৮** মুকুল টেলিভিশনে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিবেদন দেখছিল। যুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষেরা কেউ পত্র-পত্রিকা লেখালেখি করছে, কেউ দেশাত্মবোধক গান গাইছে, কেউ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা, গান গেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে জনৈক পাঠকের সংবাদ পাঠ মুকুলকে পুলকিত করে তোলে।

[সরকারি হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ? ২
- গ. মুকুলের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন দিকটির মিল লক্ষ করা যায়? ৩
- ঘ. মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে? বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

**খ** সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** মুকুলের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের মিল লক্ষ করা যায়। মুকুলের দেখা প্রতিবেদনে সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিকরা তাদের লেখা, গান, কবিতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। ঠিক একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সাথে এগিয়ে এসেছে অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন।

যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল, নৈতিক শক্তি ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতিকর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। শিল্পী, সাহিত্যিকরা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের মনোবল সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এ ছাড়া এম. আর. আখতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' এবং 'জন্মদের দরবার' অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। উক্ত অনুষ্ঠান শরণার্থীদের বাচার আশ্বাস জুগিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের খবর বহির্বিষয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

**ঘ** মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি তথা যুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল, যা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি ছিল জনগণ। তদুপরি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতিকর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তারা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি

নিয়েও নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। মূলত তারা তাদের বুদ্ধি ও মেধাশক্তি দিয়ে রণজানে মুক্তিযোদ্ধার মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছেন। সাহস ও মনোবল যুগিয়েছে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, চিকিৎসক ড. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াস উদ্দিনসহ অগণিত গুণীজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে এদেশ। মুক্তিযুদ্ধে নারী, কৃষক, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ, গণমাধ্যম, প্রবাসী বাঙালি যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি এ মহান যুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদানও অপরিণীম।

পরিশেষে বলা যায় যে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ভূমিকা রেখেছিল তেমনিভাবে এদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরাও তাদের অবদানের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

**প্রশ্ন ১৯** ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিস্টান রাজ শক্তির কাছে বসনিয় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। এতে বসনিয়ার জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোস্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারীর ইজ্জত লুটে নেয়। শিশুরাও রেহাই পায়না, তারপরও বসনিয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এখনও সেখানে বসনিয়দের বহু কবর আবিষ্কৃত হচ্ছে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বগেশ্বর]

- ক. বাংলাদেশকে কোন দেশ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে? ১
- খ. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বসনিয় জনগণের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে কোন অঞ্চলের জনগণের বৈষম্য সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যমূলক নীতির ন্যায় ইজিতকৃত অঞ্চলের সীমাহীন বৈষম্য স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল? ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে।

**খ** শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণকে দমনের জন্য ১৯৬৮ সালে যে মামলা দায়ের করা হয় তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় কংগ্রেস নেতা শতীন্দ্র লালের সাথে বৈঠক করেন। পাকিস্তান সরকার বিষয়টি জেনে যায় এবং ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে। এ জন্য এ মামলা আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। মূলত বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে চলমান ছয়দফা আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার এ মামলা দায়ের করে।

**গ** উদ্দীপকের বসনিয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য হলো বসনিয় জনগণের মতো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসন, শোষণের শিকার হতে থাকে। তারা সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। একইভাবে উদ্দীপকেও আমরা লক্ষ্য করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই খ্রিস্টান রাজশক্তির কাছে বসনিয় জনগণ শোষিত, নিপৃহীত ও বঞ্চিত হতে থাকে।

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পশ্চিম



পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসনক্ষমতার কর্তৃপক্ষ। পূর্ব বাংলার জননেতা এ কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। পশ্চিমাদের এ বৈষম্য নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং সামরিক, সামাজিক, শিক্ষাক্ষেত্রসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্যনীতিই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ বঞ্চনার দিকটিই উদ্দীপকের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যমূলক নীতির ন্যায় ইংগিতকৃত অঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানে সীমাহীন বৈষম্য সে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা উদ্দীপকে বসনিয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বসনিয়ার জনগণ বিদ্যমান খ্রিস্টান শক্তির দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। বসনিয়ার জনগণ এতে বিমুগ্ধ হয়ে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেয়। অনেক দমন নিপীড়নের পর তারা এক পর্যায়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের বসনিয়ার বৈষম্যগুলো যেভাবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্ভুদ্ধ করেছে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য তাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। শুরু থেকেই তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য থাকা স্বত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এ সময় অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্যও ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় সম্পদ ও আয় ব্যবহৃত হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। সামরিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যই তাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

**প্রশ্ন-২০** আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিংকন বিশ্ব ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিত্য সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। গেটিসবার্গ ভাষণের 'Government of the people, by the people and for the people' এ ভাষণের ফলে আমেরিকার ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটে। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

- ক. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? ১
- খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্বের সাথে আমরা আমাদের কোন মহান নেতার প্রতিচ্ছবি দেখি-আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ভাষণের ন্যায় তোমার পঠিত ভাষণের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

**খ** সৃজনশীল চ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্বের মধ্যে আমরা আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা।

৭ মার্চের ভাষণের পরপরই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে তৃতীয়। ১৮৬৩ সালে আমেরিকার মহান

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। তাঁর এ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। ঠিক একই ভাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে একটি তাৎপর্য বহুল ঘটনা। ৭ মার্চ ছিল স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের শৃঙ্খলা জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা। তবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালিকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশকে স্বাধীন করে। আর এদিক থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের থেকে অধিক তাৎপর্যবহু। সুতরাং বলা যায়, আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উভয়ই ছিল গণতন্ত্রের জন্য। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

**ঘ** প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষণের মতো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। যদিও এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তবে মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার গ্রীন সিগন্যাল দেখতে পায়। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণকে কৌশলগত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে গ্রহণ করে। "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে" বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানকে বাঙালি গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করে। স্বাধীনতাপাগল জনগণের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল সরকারি কর্মতৎপরতা অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। ১৫ মার্চ বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ৩৫টি বিধি জারি করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তাঁর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়।

**প্রশ্ন-২১** কানাডার নাগরিক বিকি বিশ্ববিখ্যাত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টের কাজ করে থাকেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের একটি যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। সে দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং দুটি অঞ্চলে বিভক্ত, একটি অঞ্চলের হাতেই অন্য অঞ্চলের সকল অর্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হতো। শোষিত অঞ্চলের মধ্যে তাদের অর্জিত সম্পদের মাত্র ১৬% ব্যয় হতো। এ ধরনের বৈষম্যের কারণেই বৃহৎ দেশটি ভেঙে শোষিত অঞ্চলটি একটি স্বাধীন দেশে রূপ নেয়। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝ? ২

গ. বিকির রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের আলোকে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধর। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

**খ** সৃজনশীল চ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ। রিকির রিপোর্টে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য এবং এর প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৩ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়া জাল ভেঙে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের এ যুদ্ধে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে স্বাধীনতা। উদ্দীপকে এ সময়ের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিকি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের একটি যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের বৈষম্যের কারণে এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উদ্দীপকের রিপোর্টে একথাই বলা হয়েছে।

ঘ। উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাহাড় সমান।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য।

মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল না। তাছাড়া স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম।

উদ্দীপকে এশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের দুটি অংশের দ্বারা পাকিস্তানের দুটি অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বোঝানো হয়েছে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত সম্পদের ১২% সে অঞ্চলে ব্যয়ের কথা বলা হলেও এ বৈষম্য ছিল আরও বেশি। ওপরের আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২২। আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিঙ্কন বিশ্ব ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। গেটিসবার্গে ভাষণের 'Government of the people, by the people and for the people' ভাষ্যটি তাকে অমরত্ব দান করে।

(বেগজা পারদিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
- খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের কৃতিত্বের সাথে আমাদের কোন মহান নেতার প্রতিচ্ছবি দেখি? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ।

খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা প্রস্তাবও জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা উত্থাপন করতে পারেনি। বরং বিষয়টিকে জাতিসংঘ ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গ. সৃজনশীল ২০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৩। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মীরজাফর, ঘসেটি বেগমের মতো বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্বে বাংলারই কতকগুলো দেশদ্রোহী ব্রিটিশদের সহায়তা করে নবাবসহ বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা কর। কিন্তু তারা আজও বাংলার মানুষদের কাছে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত।

(নিউ গড: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী)

- ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
- খ. কাদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'মীরজাফরদের দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল'— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'মীরজাফরদের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি'— উক্তিটির আলোকে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র ও কৃষিমন্ত্রী কামরুজ্জামান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

গ. উদ্দীপকে মীর জাফরের দলের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল— উক্তিটি সঠিক। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর অপতৎপরতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা। এ সকল বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর হয়ে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মীর জাফর, ঘসেটি বেগমের মতো বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্বে বাংলারই কতিপয় দেশদ্রোহী ব্রিটিশদেরকে সহায়তা করে নবাবসহ বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। ঠিক একইভাবে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি নামে দালালরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করে বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে।

ঘ. মীরজাফরের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি—উক্তিটি যথার্থ।

মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী সংগঠনের মধ্যে অন্যতম হলো রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তিকমিটি। তারা নির্যাতন, হত্যা অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন



ইত্যাদি অপরাধকর্মে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। মীর জাফরের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে যেমন প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী এ সকল দল পাকিস্তানিদের সর্বাঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে প্রমাণ করে যে তারা বাঙালি হয়েও এদেশের স্বাধীনতা চায়নি।

পাকিস্তানি সামরিক জাত্যার সহযোগী এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ এক কথায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও পাক বাহিনীর দোসর হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিত; পাকিস্তানিদেরকে পথঘাট চিনিয়ে দিত। পাকিস্তানি সেনাদের জন্য বিভিন্ন রসদ সংগ্রহ করত এবং বিভিন্ন হাট-বাজার, ঘরবাড়িতে আগুন লাগাতে সহযোগিতা করত। এরা যদি পাকিস্তানিদের সাহায্য-সহযোগিতা না করত তাহলে বাঙালিদের নয় মাস যুদ্ধ করতে হতো না। আরও অল্প সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৭৫৭ সালে বাংলার বিশ্বাসঘাতকদের কারণে যেভাবে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল একইভাবে ১৯৭১ সালে বাংলার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থান্বেষী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে বিলম্বিত করেছিল।

**প্রশ্ন ২৪** রবিন টেলিভিশনে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিবেদন দেখছিল। যুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষেরা কেউ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করছে, কেউ দেশাত্মবোধক গান গাইছে, কেউ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা, গান গেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তি যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে জনৈক পাঠকের সংবাদ পাঠ রবিনকে পুলকিত করে তোলে।

(দেবিহার সূজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা)

- ক. কত সালে ছয় দফা আন্দোলন সংঘটিত হয়? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রবিনের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন দিকটির মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে— বস্তুব্যাটি যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন হয়েছিল।

**খ** পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল অবিস্মরণীয়।

তাদের নিজের প্রাণের ওপর কোনো মায়া-মমতা ছিল না। স্বাধীনতাকামী কৃষকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অসীম সাহস আর মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধে কৃষকেরা ছিল নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসেব তারা করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই মাতৃভূমির জন্য লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করা।

**গ** সৃজনশীল ১৮ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১৮ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৫** ফিরে দেখা ৭১-এ অমি রহমান পিয়াল তার এক প্রবন্ধে 'বুন্দিজীবী হত্যায় রাজাকার আল বদর' এ লিখেছেন। "আল বদর ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাহিনী। রাজাকারদের সঙ্গে আল বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে। কিন্তু আল বদরের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন তারা হিংস্র ও

নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুন্দিজীবীদের সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে।

(দেবিহার সূজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা)

- ক. কবে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল? ১
- খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা কীরূপ ছিল? ২
- গ. অমি রহমানের বক্তব্যের আলোকে স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বাধীনতা বিরোধী হলেও অধিকাংশ মানুষই মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

**খ** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা প্রস্তাবও জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা উত্থাপন করতে পারেনি। বরং বিষয়টিকে জাতিসংঘ ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

**গ** উদ্দীপকে অমি রহমানের বক্তব্যের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আলবদর ও রাজাকারদের অপতৎপরতা ফুটে উঠেছে।

১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করে। পাক বাহিনীকে সহযোগিতার জন্য তারা কতগুলো দল গড়ে তোলে। এই দলগুলোর মধ্যে আলবদর ও রাজাকার বাহিনী ছিল অন্যতম। তারা পাকিস্তানিদের সাথে মিলিত হয়ে বাঙালিদের ওপর হত্যা ও নির্যাতন চালায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানপন্থীদের নিয়ে। এদেরকে ট্রেনিং দিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। এরা দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। বাঙালি বুন্দিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব ছিল আলবদর বাহিনীর ওপর। আল শামস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহচর ছিল। জেনারেল টিক্কা খানের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে হটানোর জন্য গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের হত্যাকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল এদেশের দালালরা। অমি রহমান পিয়ালের প্রবন্ধে পাকিস্তানি দোসরদের উল্লিখিত অপতৎপরতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বাধীনতা বিরোধী হলেও অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণপন্থী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করে। তবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অধিকাংশ লোক কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের সামরিক, বেসামরিক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাবকে গুরুত্ব না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলার কৃষকেরা। আর মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল। যুদ্ধের নয় মাস কয়েক লক্ষ মা-বোন পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হন। সারাদেশে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গানে পাক বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমেরও অনেক ভূমিকা ছিল। অনেক প্রবাসী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে

নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, সেবা দিয়ে ও খাবার সরবরাহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধা লোক স্বাধীনতা বিরোধী হলেও এদেশের অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতা, যুদ্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**প্রশ্ন ২৬** ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জোটবন্ধু হয়ে নির্বাচন করলেও এককভাবেই তারা সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় আসনে জয় লাভ করে। আওয়ামী লীগের এ জনসমর্থন দেখে রায়হানের বাবা বললেন, পাকিস্তান আমলেও আমাদের এ দলটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা তখন সরকার গঠন করতে পারিনি। তবে এ নির্বাচন আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনার অনুপ্রেরণা দেয়।

[মদনমোহন কলঙ্গ, সিঙ্গেট]

- ক. 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত ছিলেন কে? ১
- খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রায়হানের বাবা অতীতের কোন নির্বাচনের কথা মনে করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের নির্বাচনের চেয়ে উক্ত নির্বাচন ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত ছিলেন টিক্কা খান।

**খ.** শত্রু বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর যে যুদ্ধকৌশল সেটিই গেরিলাযুদ্ধ নামে পরিচিত।

গেরিলা যুদ্ধে সৈনিকরা অভ্যন্তরীণ রণাঙ্গানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সংগঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের যুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যোদ্ধারা নানা কৌশলে শত্রু বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলা করার পূর্বপর্যন্ত তারা শত্রু বাহিনীকে নিজেদের অবস্থান টের পেতে দেয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

**গ.** রায়হানের বাবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করলেন। পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের প্রতিকলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে রায়হানের বাবা পাকিস্তান আমলের একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কথা বললেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করেছেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলে ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ২৮ মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও এ নির্বাচন নিয়ে নানা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ভোটারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৩ কোটি ২২ লক্ষ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। এককভাবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের গণরায় লাভ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সরকার গঠন করতে দেয়নি। তাই বলা যায়, রায়হানের বাবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথাই স্মরণ করেছেন।

**ঘ.** হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের নির্বাচনের চেয়ে উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতনঘণ্টা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, উদ্দীপকের ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ

বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটের অজ্ঞাকে সুদূরপ্রসারী কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকেরা নির্বাচনি বিজয়কে নস্যাতির চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে এই নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের চেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ২৭** আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিংকন বিশ্ব ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি নিজের যোগ্যতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসিডেন্ট হয়ে ১৮৬৩ সালে তিনি একটি অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন গেটিসবার্গে। স্বল্প সময়ের তার এ ভাষণটি ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। কারণ এ ভাষণ ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের স্বাধীনতার জন্য এবং মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গান্ধী কলেজ]

- ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল? ১
- খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের অপতৎপরতা সম্পর্কে যা জান লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে মহান আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের তুলনায় আমাদের মহান নেতার ভাষণের তাৎপর্য আরও অনেক বেশী- মূল্যায়ন কর। ৩
- ঘ. বঙ্গবন্ধুর '৭' মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিক নির্দেশনা 'স্বাধীনতা'-এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তোমার পাঠ্য বই এর আলোকে লেখ। ৪

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম তাজউদ্দিন আহমদ।

**খ.** মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার বাহিনী নির্যাতন, হত্যা, আগ্রাসংযোগ, লুণ্ঠন সব ধরনের অপকর্মে পাকিস্তানবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। দখলদার বাহিনীর আজাবহ হিসেবে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এদের অন্যতম কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান দেওয়া, হানাদারবাহিনীদের সহায়তা দান, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার, হত্যা লুণ্ঠনসহ সকল অপকর্মে তারা জড়িত ছিল।

**গ.** উদ্দীপকে মহান আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের তুলনায় আমাদের মহান নেতার ভাষণের তাৎপর্য আরও অনেক বেশি। কেননা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অধিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত।

১৮৬৩ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ৩ মিনিটের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'Government of the people, by the people and for the people.' আর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' ৭ মার্চের এ ৭টি শব্দ বাঙালিকে দুর্বীর করে তুলেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। যদিও বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের



স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তারপরও মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার সবুজ সংকেত দেখতে পান। তিনি স্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তার এ ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ভাষণটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর এদিক থেকেই আব্রাহাম লিংকনের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অধিক নির্দেশনামূলক ও গুরুত্ববহ।

**ঘ** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিকনির্দেশনা ছিল তা হলো 'স্বাধীনতা'। এ ভাষণের পরপরই পূর্ব বাংলার জনগণ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হয়ে উঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এই ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কেননা এর মধ্যে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও মুক্তিপাগল বাঙালি এ ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার গ্রিন সিগন্যাল দেখতে পায়— যা বাঙালিদেরকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশে সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকায় ১৩ মার্চ সরকার দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দিলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করে ৩৫ দফা দাবি জারি করেন এবং জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খান প্রহসনমূলক আলোচনার জন্য ঢাকায় আসে। ঢাকা ত্যাগ করার আগে সামরিক বাহিনীকে বাঙালির ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

**প্রশ্ন ২৮** একাত্তর সালের আগে বিশ্বের মানচিত্রে যে বাংলাদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় অগ্নিবরা মার্চের বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। এ ভূখন্ডের মানুষের হৃদয়ের মানচিত্রে আঁকা হচ্ছিল স্বদেশের সীমানা। ১৯৭১ সালের মার্চে ঢাকাসহ সারা দেশে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেন সমুদ্রের মতো গর্জে ওঠে।

*(নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ)*

- ক. বাংলাদেশে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১
- খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ২
- গ. ১৯৭১ সালের অগ্নিবরা মার্চের বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে ওঠেছিল কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ডিসেম্বর ১৪ তারিখে পালন করা হয়।

**খ** সৃজনশীল ৬ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেও ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সরকারের টালবাহানা অগ্নিবরা মার্চের জন্ম দিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশ্রানে সারা বাংলায় সার্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ করে

টালবাহানা করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকহানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকা শহরের ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে দেয় গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে। পাকিস্তান সৈন্যদের হাতে বন্দি হবার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন। তার এ ঘোষণাটি ২৬ মার্চ মো. আব্দুল হান্নান এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। এ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে শুরু হয় প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রাম। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ দ্বিধাধীনচিত্তে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করে স্বাধীনতা।

**ঘ** ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার "আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। কারণ, তাদের দীর্ঘ ২৪ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা, ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। নির্বাচনের রায় স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা আরো বলিষ্ঠ ও শাগিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে ঢাকায় এসে গোপনে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। হুকুম মতো ২৫ মার্চ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই হত্যা, অত্যাচার-অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালি জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

**প্রশ্ন ২৯** ১৯৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩ মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। কারণ ঐ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। *(জেলা সরকারি কলেজ, জেলা)*

- ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা মূলক অভিযানের নাম কী? ১
- খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের কোন মহান নেতার ভাষণকে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আব্রাহাম লিংকনের মতো বাংলাদেশের উক্ত মহান নেতার ভাষণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

#### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা মূলক অভিযানের নাম হলো অপারেশন সার্চলাইট।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩০** বুবেল, পাভেল, শামীমসহ অনেকেই তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা

করে দেশ স্বাধীন করেছিল। তাদের অনেক বন্ধু প্রাণ হারালেও তারা ভয় পেয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। যুদ্ধকে তারা 'জয় অথবা মৃত্যু' হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

[গাজীপুর সিটি কলেজ]

- ক. ২৫শে মার্চের গণহত্যাকে কী নাম দেয়া হয়? ১
- খ. খিলাফত আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের সাহসের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, এ শ্রেণির লোকদের আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ২৫ মার্চের গণহত্যাকে অপারেশন সার্চলাইট নাম দেয়া হয়।

খ. তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য ১৯২০-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মুসলমানদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তাই ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

খিলাফত ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষা ও খিলাফত রক্ষার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে ইতিহাসে তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রসমাজের সাহসের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫২ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ছাত্রদের মনে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। যেটি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বুবেল, পাভেল, শামীমসহ অনেকেই তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে দেশ স্বাধীন করেছিল। তাদের অনেক বন্ধু প্রাণ হারালেও তারা ভয় পেয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। যুদ্ধকে তারা 'জয় অথবা মৃত্যু' হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রসমাজের মধ্যে অনুরূপ চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। অল্প দিনের প্রশিক্ষণে হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ জীবন বাজি রেখে তারা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হননি। তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রদের অসীম সাহস এবং ভূমিকার কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রেণি অর্থাৎ ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

যেকোনো প্রকারের চ্যালেঞ্জিং কাজ করার জন্য যৌবনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। মানুষের যৌবনের বিরাট অংশ কাটে ছাত্রাবস্থায়। এসময় ছাত্ররা যেকোনো বীরত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। যেমনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পেছনে ছাত্রদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা পাকিস্তানি বাহিনীর শিক্ষিত সৈনিক এবং আধুনিক

অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলায় প্রশিক্ষণবিহীন এবং অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অনেকে সরাসরি যুদ্ধ করেছে। অনেকে ভারত থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। ছাত্ররা অনেকটা নিজ উদ্যোগে কখনও গণবাহিনী, কখনও মুজিব বাহিনী, কখনও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী নামে সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অকুতোভয় ছাত্রসমাজ অনেক ক্ষেত্রে চোখের সামনে বন্ধু ও সাথিকে মরতে দেখেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেনি। তাদের পণ ছিল- হয় বিজয় না হয় মৃত্যু-এর মাঝে আর কিছু নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

প্রশ্ন-৩১ সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে কোরিয়ার দুই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। এর ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কোরিয়ার একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর কোরিয়ার একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এতে বহু নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ এবং শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর ঘৃণার পায়ে পরিণত করে। অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়।

[কম্বোজার সিটি কলেজ]

- ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা কত ছিল? ১
- খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খন্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি।

খ. সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন-৩২ জনাব সাদমান ও সুমাইয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল। সাদমান বলল, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ছয় দফার বিজয়। একমত পোষণ করে সুমাইয়া বলল এ নির্বাচনে বিজয় এবং ৭ মার্চের ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে।

[পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

- ক. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি কী? ১
- খ. ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সাদমানের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সুমাইয়ার বক্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি।

খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে সকল বাঙালি একত্রিত হয়ে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে, যার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে।



১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ভিত্তি লাভ করে। এছাড়াও নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিকরূপ লাভ করে। তাই এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

**গ** উদ্দীপকে সাদমানের বক্তব্য অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ছয় দফার বিজয় — কথাটি সঠিক।

১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানে মূলত ছয় দফার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছয় দফা ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি, মুক্তির সনদ। পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। উদ্দীপকের সাদমানের বক্তব্যে এই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ছয় দফার দাবি ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এটি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি। বাংলার জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ক্ষেত্রে ছয় দফার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছয় দফার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমা শাসকচক্রকে আঘাত হানে, তাই এটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যেখানে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। আর এই ছয় দফাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগকে জয়ী করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পূর্ব পাকিস্তানিদের বিজয়। আর পূর্ব পাকিস্তানিদের বিজয় মানেই ছয় দফার বিজয়।

**ঘ** উদ্দীপকে সুমাইয়ার বক্তব্য অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিজয় এবং ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে— বক্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয়ের ফলে বাঙালি জাতি সংগ্রামী চেতনায় উদ্ভূত হয়। নিজেদেরকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে ভাবতে শেখে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং এ ফলাফল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্ভূত করে। এছাড়া ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। উদ্দীপকে সুমাইয়ার বক্তব্যেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফলে বীর বাঙালি যুদ্ধের ইজিত পায় এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। পরে ১৬ মার্চ—২২ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যর্থ আলোচনা সমাপ্ত হতে না হতেই পাক শাসকগোষ্ঠী ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর নিষ্ঠুর অভিযান চালায়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি অর্জন করে মহান স্বাধীনতা— যা মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রকৃত রূপদান।

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পথ নির্দেশক হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

**প্রশ্ন ৩৩** টিভিতে একটি গণকবরের প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয়। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়গোড় আর পঁচা লাশ। পাশাপাশি দুটি বিশাল গর্ত। আনুমানিক তিন চারশ মানুষের মরদেহ এখানে মাটি চাপা দেওয়া আছে। এগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরাপদ মানুষের সমাধি। হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আল বদরদের হাতে তারা শহিদ হয়েছেন।

(বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম)

- ক. বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম কী ছিল? ১
- খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের আলোকে উক্ত সময়ের সংঘটিত নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দাও। ৪

#### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম বৈদ্যনাথতলা।

**খ** সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৪** ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিস্টান রাজশক্তির কাছে বসনিয়ার জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শোষিত ও নিপৃহীত হতে থাকে। এতে বসনিয় জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোস্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। রাজকীয় সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে, বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারী, শিশুরাও তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। তারপরও বসনিয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ)

- ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? ১
- খ. ছয়দফা দাবীকে ম্যাগনাকাটা বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বসনিয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যাসহ লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ দাও। ৪

#### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ হলেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

**খ** ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির পথ সূচিত হওয়ায় এটিকে ম্যাগনাকাটা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকাটা অধিকার বিল, ঠিক তেমনি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হলো ছয় দফা। এ জন্য এটিকে ম্যাগনাকাটা বলা হয়।

**গ** সৃজনশীল ৭ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

### অধ্যায়-৬: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৩১৭. গণঅভ্যুত্থান কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? (জান)

- ক) ১৯৭৮                      খ) ১৯৬৯  
গ) ১৯৬৮                      ঘ) ১৯৬৭

৩১৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয় লাভ করে? (জান) [সরকারি ডোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]

- ক) পাকিস্তান পিপলস পার্টি  
খ) মুসলিম লীগ  
গ) আওয়ামী লীগ                      ঘ) ন্যাপ

৩১৯. ন্যাপ এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জান)

- ক) মওলানা ভাসানী                      খ) এ.কে ফজলুল হক  
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী  
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

৩২০. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? (জান)

- ক) নৌকা                      খ) কাঁচি  
গ) কোদাল                      ঘ) দেয়াল ঘড়ি

৩২১. নিচের কোন রাজনৈতিক দল ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কোনো আসন লাভ করেনি?

- ক) পিপসি                      খ) ন্যাপ (ওয়ালি)  
গ) ন্যাপ (ভাসানী)                      ঘ) পিডিপি

৩২২. কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হয়েছিল? (জান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক) ১৯৫৬ সালের                      খ) ১৯৭০ সালের  
গ) ১৯৭৩ সালের                      ঘ) ১৯৭৯ সালের

৩২৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়টি আসনে জয়ী হন? (জান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]

- ক) ৫৮                      খ) ৬৮  
গ) ৭৮                      ঘ) ৮৮

৩২৪. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় কেন? (অনুধাবন)

- ক) প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের চাপে  
খ) তীব্র ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের ফলে  
গ) সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে এ আশংকায়  
ঘ) তৃতীয় শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা থাকায়

৩২৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের অন্যতম প্রকৃতি ছিল কোনটি? (অনুধাবন) [কুমিল্লা মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]

- ক) জনগণকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান  
খ) জনগণকে দেশত্যাগ করার আহ্বান  
গ) জনগণকে অর্থ সম্পদ জমা করার আহ্বান

ঘ) জনগণকে ঘরে বসে থাকার আহ্বান

৩২৬. মাকসুদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসে একটি ভাষণের কথা স্মরণ করলেন। মাকসুদ কোন ভাষণের কথা মনে করলেন? (প্রয়োগ)

- ক) আব্রাহাম লিংকনের                      খ) ৭ মার্চের  
গ) পন্টন ময়দানের                      ঘ) কাগমারীর

৩২৭. 'বাঙালির তাজ রক্ত মাড়িয়ে আমি কোনো সম্মেলনে বসতে পারি না'— উক্তিটি করেছেন— (অনুধাবন)

- ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  
খ) মওলানা ভাসানী  
গ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক  
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩২৮. ২৫ মার্চের রাতের গণহত্যা কী নামে পরিচিত? (জান)

- ক) অপারেশন ডালডাড  
খ) অপারেশন ব্লিনহাট  
গ) অপারেশন সার্চলাইট  
ঘ) অপারেশন রোবেল হান্ট

৩২৯. 'অপারেশন সার্চলাইট' সংঘটিত হয়েছিল কখন? (জান)

- ক) ১৯৫২ খ্রি.                      খ) ১৯৬৬ খ্রি.  
গ) ১৯৬৯ খ্রি.                      ঘ) ১৯৭১ খ্রি.

৩৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? (জান) [সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ]

- ক) জগন্নাথ হল                      খ) জহুরুল হক হল  
গ) ফজলুল হক হল                      ঘ) শেখ মুজিব হল

৩৩১. জনাব ক নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিশাল জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। জনাব ক ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক) শেখ মুজিবুর রহমানের  
খ) ইয়াহিয়া খানের  
গ) জুলফিকার আলী ভুট্টোর  
ঘ) এম মনসুর আলীর

৩৩২. ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? (জান) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]

- ক) রমনা পার্ক                      খ) রমনা উদ্যান  
গ) বঙ্গবন্ধু এডিনিউ                      ঘ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

৩৩৩. মুজিবনগর বর্তমান কোন জেলায় অবস্থিত? (জান)

- ক) কুষ্টিয়া                      খ) চুয়াডাঙ্গা  
গ) মেহেরপুর                      ঘ) বিনাইদহ

৩৩৪. প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন? (জান) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]

- ক) এম এ জি ওসমানী                      খ) মেজর শফিউল্লাহ  
গ) এ কে খন্দকার                      ঘ) মেজর জলিল



৩৩৫. মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান

কে? (জ্ঞান) [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]

- ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- খ) তাজউদ্দিন আহমদ
- গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- ঘ) মোশতাক আহমদ

৩৩৬. কোন সময়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার

শপথ গ্রহণ করে? (জ্ঞান) [খ্রীষ্টান সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]

- ক) ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ
- খ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- গ) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
- ঘ) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ

৩৩৭. অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার কোথায় গঠন করা

হয়? (জ্ঞান) [সরকারি সারনা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]

- ক) মেহেরপুর জেলায়
- খ) চুয়াডাঙ্গা জেলায়
- গ) রাজশাহী জেলায়
- ঘ) ঢাকা জেলায়

৩৩৮. প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে

ছিলেন? (জ্ঞান) [দালালনিরহাট সরকারি কলেজ]

- ক) এমএজি ওসমানী
- খ) মেজর শফিউল্লাহ
- গ) এ কে খন্দকার
- ঘ) মেজর জলিল

৩৩৯. অস্থায়ী সরকারের শপথবাক্য কে পাঠ করান?

(জ্ঞান)

- ক) অধ্যাপক রহমত আলীকে
- খ) অধ্যাপক মুজাফফর আহমদকে
- গ) অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে
- ঘ) অধ্যাপক মুদাচ্ছের আলীকে

৩৪০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সেনাপ্রধান কে

ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) আতাউল গনি ওসমানী
- খ) কে. এম. আশরাফ সিদ্দিকি
- গ) কর্নেল শওকত উসমান
- ঘ) ড. কে খন্দকার

৩৪১. মুজিব নগর অস্থায়ী সরকারের কয়টি মন্ত্রণালয়

ছিল? (জ্ঞান) [সুনাগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) ১০
- খ) ১২
- গ) ১৪
- ঘ) ১৬

৩৪২. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র নৌ অঞ্চল কত সেক্টরের

অধীনে ছিল? (জ্ঞান) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- ক) ১০
- খ) ৯
- গ) ১১
- ঘ) ৮

৩৪৩. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ? (জ্ঞান)

- ক) ভুটান
- খ) নেপাল
- গ) ভারত
- ঘ) মালদ্বীপ

৩৪৪. 'ফ্রিডম ফাইটার্স' এর সরকারি নাম কী ছিল? (জ্ঞান)

- ক) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী
- খ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
- গ) গণ বাহিনী
- ঘ) মুজিব বাহিনী

৩৪৫. কত তারিখে বাংলাদেশ-ভারত একটি যৌথ

কমান্ড গঠন করা হয়? (জ্ঞান) [ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

- ক) ১৭ নভেম্বর
- খ) ১৯ নভেম্বর
- গ) ২১ নভেম্বর
- ঘ) ২৩ নভেম্বর

৩৪৬. মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীকে কেন গেরিলা

বাহিনী বলা হয়? (অনুধাবন)

- ক) দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছিল বলে
- খ) দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছে বলে
- গ) সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে বলে
- ঘ) কৌশলে অত্যন্তভাবে আক্রমণ করেছে বলে

৩৪৭. বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ কী? (অনুধাবন) [জয়পুরহাট

সরকারি মহিলা কলেজ, জয়পুরহাট]

- ক) ব্যক্তিগত শত্রুতা
- খ) জাতিকে মেধাশূন্য করা
- গ) শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ফেলা
- ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের ভীতি প্রদর্শন

৩৪৮. মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য তারামন বিবি ও

ভক্তার সিতারা বেগম কোন খেতাবে ভূষিত হন?

(জ্ঞান) [পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) বীরশ্রেষ্ঠ
- খ) বীরউত্তম
- গ) বীরবিক্রম
- ঘ) বীরপ্রতীক

৩৪৯. সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে সংগঠন সৃষ্টি হয়

তার নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, গিরোজপুর]

- ক) শান্তি কমিটি
- খ) রাজাকার
- গ) আলবদর
- ঘ) আলশামস

৩৫০. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়— (জ্ঞান)

- ক) ১৩ ডিসেম্বর
- খ) ১৪ ডিসেম্বর
- গ) ১৫ ডিসেম্বর
- ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

৩৫১. বাংলাদেশ কত তারিখে স্বাধীনতা অর্জন

করেছিল? (জ্ঞান)

- ক) ১৭ ডিসেম্বর
- খ) ১৬ ডিসেম্বর
- গ) ১৮ ডিসেম্বর
- ঘ) ১৯ ডিসেম্বর

৩৫২. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে

কত তারিখে? (জ্ঞান)

- ক) ১৩ ডিসেম্বর
- খ) ১৪ ডিসেম্বর
- গ) ১৫ ডিসেম্বর
- ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

৩৫৩. কার নির্দেশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে

যুদ্ধবিরতি শুরু হয়? (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]

- ক) জেনারেল নিয়াজির
- খ) টিক্কা খানের
- গ) ইয়াহিয়া খানের
- ঘ) ভূটোর

৩৫৪. ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ কে

ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) জেনারেল মনরো
- খ) জেনারেল যশোবন্ত
- গ) জেনারেল খুশবন্ত
- ঘ) জেনারেল নিয়াজি

৩৫৫. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের

প্রতিনিধিত্ব করেন কে? (জ্ঞান) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- ক) শফিউর রহমান
- খ) একে খন্দকার
- গ) মেজর শওকত আলী
- ঘ) এমএজি ওসমানী



৩৫৬. মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক) লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা  
খ) লে. জেনারেল টিক্কা খান  
গ) লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়োজী  
ঘ) জেনারেল (অব.) ওসমানী

৩৫৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)

- ক) ৭ মার্চ  
খ) ৭ অক্টোবর  
গ) ৭ নভেম্বর  
ঘ) ৭ ডিসেম্বর

৩৫৮. ২৫ মার্চের রাত কেন বাঙালির ইতিহাসে কালরাত হিসেবে খ্যাত? (অনুধাবন)

- ক) ঐ রাতে অনেক অশ্রুকার ছিল বিধায়  
খ) ঐ রাতে অমাবস্যা ছিল বিধায়  
গ) ঐ রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না বলে  
ঘ) ঐ রাতে নিরীহ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল বলে

৩৫৯. ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? (অনুধাবন) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

- ক) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য  
খ) ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য  
গ) মুক্তিযুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য  
ঘ) শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে

৩৬০. মুজিবনগর সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কোনটি? (অনুধাবন)

- ক) সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা  
খ) যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসা  
গ) অস্ত্র কারখানা নির্মাণ করা  
ঘ) চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা

৩৬১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সার্বজনীন গণযুদ্ধ বলা হয়ে থাকে কেন? (অনুধাবন)

- ক) আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় বলে  
খ) ভারত মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে বলে  
গ) চীন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বলে  
ঘ) যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বলে

৩৬২. ইয়াখিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব দেন তা হলো— (অনুধাবন) [কলকাতার সরকারি কলেজ, কলকাতা]

- i. সংবিধান রচনা করা  
ii. ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল  
iii. গণভোটের আয়োজন ও আইন কাঠামো তৈরি

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল— (অনুধাবন) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- i. অবাধ  
ii. স্বাধীন  
iii. নিরপেক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৪. স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে— (অনুধাবন)

- i. পাক শোষকশ্রেণির পরাজয়  
ii. বীর বাঙালির মুক্তি অর্জন  
iii. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৫. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন) [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]

- i. বক্তাবন্ধুকে সন্তুষ্ট করা  
ii. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা  
iii. আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৬. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল— (অনুধাবন)

- i. দক্ষিণপন্থি দল  
ii. ধর্মভিত্তিক দল  
iii. গণতান্ত্রিক দল

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি কমিটির কাজ ছিল— (অনুধাবন) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

- i. বাংলাদেশের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারণা  
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের দুশ্চিন্তাকারী হিসেবে উল্লেখ করা  
iii. মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৮. ১৯৭১ খ্রি. বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সময় পাক হানাদারদের দোসর ছিল— (অনুধাবন)

- i. রাজাকার বাহিনী  
ii. আলবদর বাহিনী  
iii. বিহারী সম্প্রদায়

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩৬৯. ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সময় পাক হানাদারদের দোসর ছিল— (অনুধাবন) [সরকারি শোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]

- i. রাজাকার বাহিনী  
ii. আলবদর বাহিনী  
iii. বিহারী সম্প্রদায়

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii



৩৭০. আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরের সময় বারা উপস্থিত ছিলেন? (অনুধাবন) (ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ)

- i. জেনারেল নিয়াজি ii. এ কে খন্দকার  
iii. জগজিৎ সিং অরোরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭১. আকজাল বলেন যে, বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এখানে বলা হয়েছে— (প্রয়োগ)

- i. ভারতের কথা ii. নেপালের কথা  
iii. রাশিয়ার কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে— (অনুধাবন)

- i. সামরিক আইন প্রত্যাহার  
ii. গণহত্যার তদন্ত করা  
iii. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭৩. ১৯৬৯ সালে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)

- i. বিচারপতি আবদুল সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত  
ii. একটি সার্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা  
iii. এ ভোটার তালিকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৪ ও ৩৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
জনাব মর্তজা সাহেব বলেন এই নেতার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আর প্রায় দীর্ঘ নয় মাস এই নেতার নেতৃত্বেই আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম।

৩৭৪. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন নেতার প্রতি ইজিত প্রদান করে? (প্রয়োগ)

- ক মওলানা ভাসানী  
খ শেখ মুজিবুর রহমান  
গ এ. কে. ফজলুল হক  
ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩৭৫. উক্ত নেতা অংশগ্রহণ করেছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ডায়া আন্দোলনে  
ii. গণঅভ্যুত্থানে

iii. ছয়দফা আন্দোলনে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৬-৩৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব রহিম স্যার বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যেই এই সরকার গঠন করা হয়েছিল। এছাড়াও স্যার বলেন যে, এ সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন করে সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল।

৩৭৬. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- ক আইয়ুব সরকার  
খ আওয়ামী সরকার  
গ মুজিবনগর সরকার  
ঘ শমসেরনগর সরকার

৩৭৭. উক্ত সরকারের অন্যতম মন্ত্রণালয় ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
ii. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
iii. জাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭৮. উক্ত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ক্যান্টেন মুনসুর আলী  
ii. এ.এইচ এম কামরুজ্জামান  
iii. খন্দকার মোশতাক আহমেদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৯ ও ৩৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাসুদ সাহেব বলেন যে, এই দিন যুদ্ধ শেষে আমরা বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। সেদিন যেন ঢাকা হয়ে উঠেছিল আনন্দপুরী। স্বাধীন দেশের কেতন যেন অবিরামভাবে উড়তে শুরু করল।

৩৭৯. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন দিবসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- ক ১৬ ডিসেম্বর খ ২৬ মার্চ  
গ ২৮ মার্চ ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি

৩৮০. উক্ত দিবসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়  
ii. স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু  
iii. বাঙালি জাতির শত্রুমুক্ত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii  
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii